بسم الله الرحمن الرحيم

কানাডার টরেন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ জামাতের দু'জন খাদেম বা সেবকের কথা আমি বলব সম্প্রতি যাদের ইন্তেকাল হয়েছে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব, আর অপরজন ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা। এই পৃথিবীতে যে আসে তাকে পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিতেই হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবার তৌফিক দান করেন আর মানবতার সেবা করারও সুযোগ প্রদান করেন। বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব দীর্ঘদিন জামাতের সেবক এবং মুবাল্লিগ ছিলেন, এছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বেও তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খুবই সুচারুভাবে তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর প্রায় ৮৫ বছর বয়সে লন্ডনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে ১৯৫৮ সনে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুরোনো আহমদী পরিবারের সদস্য। তার মায়ের নাম ফাতেমা বিবি যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস খান সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। উনার পিতার নাম ছিল দানেশমন্দ খান সাহেব। ১৮৯০ এর কাছাকাছি সময়ে তার জন্ম হয়। তিনি দিব্যদর্শন এবং সত্য-স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বশীর রফীক খান সাহেব জন্মসূত্রে আহমদী। তার পিতা ১৯২১ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে গ্রামবাসীরা তাকে সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে দেয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) বশীর রফীক খান সাহেবকে তার পিতা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, আপনার পত্র সবসময় আপনার পুণ্যবান পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর তার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। কথা এবং কাজের স্ববিরোধিতা থেকে তিনি পবিত্র এবং নিষ্ঠা ও সত্যতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এই হলো সেই বৈশিষ্ট্য যা এক মু'মিন এবং আহমদীর মহিমা-প্রকাশক। তিনি আরো লিখেন, তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং রয়েছে, আর এর বহিঃপ্রকাশও সবসময় ঘটে দোয়ারূপে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে রহমতে শিক্ত করুন, আর তার সন্তান-সন্ততিকে সত্যিকার অর্থে তার উত্তরাধিকারী করুন। ১৯৫৬ সনে সেলীমা নাঈ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয় যিনি আব্দুর রহমান খান সাহেবের কন্যা ছিলেন, আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী খান আমীরুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাদের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে। ১৯৪৫ সালে খান সাহেব কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলে ভর্তি হন।

তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। সে যুগে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক খুতবায় আহমদী যুবকদের জীবন উৎসর্গ করার তাহরীক করেন। এতে জুমুআর নামায শেষ হতেই এ তাহরীকে অংশ নিতে বেশ কিছু সংখ্যক যুবক নিজেদের নাম পেশ করে। আর এসব সৌভাগ্যশালী যুবকদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে যুগে আজকের মত ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ বা যথাযথ ছিল না। যাহোক তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যক্তিগত পত্র প্রাপ্ত হন যে, আপনার ওয়াকফ গৃহিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যতদিন দেশ বিভক্ত হয়নি তিনি কাদিয়ানেই পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন। মেট্রিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অথবা দেশ বিভাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি নিজ পৈত্রিক অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর হঠাৎ একদিন প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাই যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, কাদিয়ানে এক পাঠান ছাত্র ছিল যে জীবন উৎসর্গ করেছিল কিন্তু তার নাম মনে নেই যে, সে কে ছিল। আর দেশ বিভাগের কারণে রেকর্ডও হারিয়ে গেছে বা রাবওয়ায় রেকর্ড ছিল না, তাই তার খোঁজ করুন যে, ১৯৪৫ সনের ছাত্রদের মাঝে সে কে, যে জীবন উৎসর্গ করেছিল। ঘটনাক্রমে তাদের ঘরেও এই পত্র আসে। আর তিনি লিখে জানিয়ে দেন যে, আমিই ছিলাম সেই ছাত্র। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে নির্দেশ দেন, অনতিবিলম্বে রাবওয়া উপস্থিত হও আর তালীমুল ইসলাম কলেজ লাহোর-এ ভর্তি হও এবং বি.এ. ডিগ্রি অর্জন কর। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৫৩ সনে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে মগ্ন ছিলাম আর এমনই সময় আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যায়। (সেই অবস্থার মধ্যেই তিনি পরীক্ষা দেন) এই পরীক্ষার ফলাফল বের হলে তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হই, কেননা আমি ফেইল করি। কিন্তু একইসাথে আমার এই দুশ্চিন্তাও ছিল যে, ফেইল-ই যদি আমার হওয়ার ছিল তাহলে পরীক্ষার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তো আমাকে স্বপ্নে প্রশ্নপত্রও দেখিয়েছিলেন যে, পরীক্ষায় এইসব প্রশ্ন আসবে, আর তা এসেছেও। সেইসাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও দৃঢ়তার সাথে আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি পাশ করবে। তিনি বলেন, এসব কারণে মাঝে মধ্যেই আমার ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। এরপর পত্রিকায় ফলাফল প্রকাশ পায়। আমি মনমরা অবস্থায় বসা ছিলাম। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন যে, কি হয়েছে? আমি কারণ উল্লেখ করলে তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই, আবার পরীক্ষা দিয়ে দিও। কেননা পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে তুমি হয়তো প্রস্তুতি নিতে পারনি। কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই তার পিতা তাকে বলেন, আমি যখনই তোমার জন্য দোয়া করি তখন আমি এই ধ্বনিই শুনতে পাই যে, বশীর আহমদ পাশ করেছে। কিন্তু আমি যখন তাকে কলেজের ফলাফল দেখাতাম তখন তিনি নীরব হয়ে যেতেন। কয়েকদিন পর আবার বলতেন যে, আমি তো এই উত্তরই পাচ্ছি যে, তুমি পাশ করেছ। তিনি বলেন, একদিন ডাকযোগে দৈবক্রমে বহু পত্র আসে। আর তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও একটি পত্র ছিল। আমি তা খুলে হতভম্ব হয়ে যাই কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভুলবশত তোমাকে ফেল দেখানো হয়েছিল, এখন

উত্তরপত্র পুনরায় যাচাইয়ের পর ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তুমি পাশ করেছ। তিনি বলেন, কিছুদিন পর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে যাই এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, দোয়ার পর আমাকে তোমার পাশের সংবাদ জানানো হয়েছে যা আমি তোমাকে অবহিতও করেছিলাম যে, তুমি পাশ করবে। অতএব এই যে ফলাফল এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐশী সিদ্ধান্তকে কেউ টলাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যা তিনি জানিয়েছিলেন। নতুবা এটি তো হাস্যোস্কর ব্যাপার হতো যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কেও এবং তার পিতাকেও একদিকে বলছেন যে, তিনি পাশ করবেন অথচ ফলাফল শেষ পর্যন্ত হয়েছে ভিন্ন। যাহোক সত্য প্রমাণিত হয়েছে সেই কথাই যা আল্লাহ্ তা'লা অবহিত করেছিলেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, এখন তুমি জামেয়ায় ভর্তি হয়ে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন কর। আমার ইচ্ছা হলো, তবলীগের ময়দানে তোমাকে প্রেরণ করা হোক। তিনি বলেন, জামেয়ায় আমাদের ক্লাসের এই বিশেষ সম্মান লাভ হয়েছিল যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বেশ কয়েকবার আমাদের ক্লাসে আসেন আর জ্ঞানমূলক বিভিন্ন বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জনের রীতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকেন। তখন খলীফা সানী (রা.) বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্রত্যেক ছাত্রেরই ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা উচিত এবং বই ক্রয় করার অভ্যাসও থাকা উচিত। আর এটি এমন একটি কথা যা জামেয়ার সকল ছাত্রের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। পৃথিবীতে এখন বহু জামেয়া রয়েছে, আর অনেক ওয়াকেফে জিন্দেগী রয়েছে, তাদের সবার নিজস্ব লাইব্রেরী থাকা উচিত। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত মুরুব্বীদের মিটিংয়েও আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা উচিত। শুধু জামাতী লাইব্রেরীর ওপর নির্ভর করবেন না। তিনি বলেন, জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করার পর আমি ওকালতে তবশীর-এ উপস্থিত হই। সেই সময় মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব উকীলুত তবশীর ছিলেন। তিনি আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, একে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেয়া হোক। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বে উকীলুত তবশীর সাহেব আমাকে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। হুযূর (রা.) আমাকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং দোয়ার সাথে বিদায় দেন আর কোলাকুলি করেন। ১৯৫৯ সনে তিনি যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত হন এবং সেখানে পৌঁছে যান। আর লন্ডনের ফযল মসজিদে নায়েব ইমাম হিসেবে তার কাজ আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, ১৯৫৯ সনে ইংল্যান্ড-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে তিনি একদিন মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেবের কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে কিছু নসীহত করার জন্য অনুরোধ করেন। মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব দীর্ঘদিন লন্ডন মসজিদের ইমাম হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি তাকে বিভিন্ন নসীহত করেন আর বলেন যে, আমি তোমাকে একটি নসীহত করছি যা থেকে আমি সারা জীবন অনেকটা লাভবান হয়েছি। শামস সাহেব বলেন, আমি যখন সিরিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত ছিলাম তখন একটি সম্পদশালী

পরিবারের এক ব্যক্তি জনাব মুনীরুল হাসনী সাহেব আমার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বয়সে প্রবীণ নিবেদিত প্রাণ একজন আহমদী ছিলেন। এর পরেই সিরিয়ায় জামাতের বিস্তার হয়। তিনি বলেন, এরপর তার ধর্মসেবার প্রেরণা এবং চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুনীরুল হাসনী সাহেব প্রতিদিন আসরের পর মিশন হাউসে চলে আসতেন, সিরিয়াতে সে যুগে মিশন হাউস ছিল এবং কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তিনি বলেন, মিশন হাউসে এসে তিনি সাগ্রহে আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন, আর এই দায়িত্বে তিনি ছিলেন অনড়। রাতে আমরা উভয়ে সেই খাবার খেতাম। একদিন খাবার খেতে বসে মুনিরুল হাসনী সাহেবকে আমি বলি যে, আজ তরকারিতে লবণ বেশি হয়েছে, ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান থাকবেন। মুনীরুল হাসনী সাহেব বেশ সম্পদশালী ছিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বলেন, 'মৌলানা সাহেব! আপনি জানেন যে, আমার বাসায় কাজের জন্য বেশ কিছু সেবক রয়েছে, আমি সন্ধ্যায় যখন ঘরে যাই তখন আমার জুতার ফিতাও চাকররা এসে খুলে দেয়। আমি আমার ঘরে কোনদিন এক কাপ চা-ও নিজ হাতে বানাইনি। এখানে এসে আমি আপনার জন্য যে খাবার প্রস্তুত করি তা শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করি, নতুবা কোথায় আমি আর কোথায় তরকারি রান্না করা। তাই কখনও যদি মসলা কম বেশি হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা খাবার রান্না করা আমার কাজ নয়।' এই ঘটনা শুনিয়ে মৌলভী শামস সাহেব বলেন, এই ঘটনা থেকে আমি এটি শিখেছি যে, আগ্রহের সাথে যারা আমাদের অর্থাৎ মুবাল্লিগদের সেবা করে তারা কখনোই আমাদের ব্যক্তিগত কোন গুণের কারণে তা করে না বরং খোদার সন্তুষ্টি এবং আহমদীয়া জামাতের ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে করে। তাই সবসময় এ কথা আমাদের দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত যে, মানুষ আমাদের যতটাই সেবা করে, এটি আমাদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ। যদি তারা এতে কোন ভুল করে তাহলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কোন অধিকার আমাদের নেই বা তাদের সমালোচনা করারও কোন অধিকার নেই।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ সেবকবৃন্দ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে দান করেছেন, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সেই দান করা অব্যাহত রেখেছেন।

তিনি বলেন, লন্ডন মসজিদের ইমাম জনাব চৌধুরী রহমত খান সাহেব তার অসুস্থতার কারণে ১৯৬৪ সনে দেশে ফিরে যান এবং রফিক সাহেবকে মসজিদ ফযলের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সনে বশীর রফিক সাহেব ইংরেজী পত্রিকা 'মুসলিম হ্যারাল্ড' প্রকাশ করা আরম্ভ করেন আর প্রথম দিকে তা দশ পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। তিনি নিজেই এর এডিটর বা সম্পাদক ছিলেন এবং বাকি সব কাজও নিজেই করতেন। ১৯৬২ সনে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের প্রেরণায় পাক্ষিক 'আখবারে আহমদীয়া' পত্রিকা চালু করেন। তিনি বলেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও আমি ছিলাম এবং দীর্ঘদিন এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও আমার লাভ হয়েছে আর এর জন্য নিয়মিত প্রবন্ধাদি লেখারও তৌফিক পাই। তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন। হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) কর্তৃক সূচীত পত্রিকা 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) ১৯৬৭ সন থেকে আরম্ভ করে তার খিলাফতকালে পর্যায়ক্রমে আট বার ইউরোপ সফর করেন। এই সফরের সাতটিতেই মৌলানা বশীর রফিক সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও দু'বার সফরসঙ্গী হয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় তার। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সনে আবার লন্ডন ফিরে আসেন। আর ইমাম হিসেবে নিজের পুরোনো দায়িত্ব পুনরায় বুঝে নেন। ১৯৭৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর সাথে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত সচীব হিসেবে আমেরিকা ও কানাডা সফরে যাওয়ার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। ১৯৭৮ সনের মে মাসে 'আন্তর্জাতিক কাসরে সালীব' যে সম্মেলন (লন্ডনে) হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এসেছিলেন আর এর ব্যবস্থাপনাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার জন্য ইংল্যান্ডের বন্ধুগণ, মসলিসে আমেলা এবং কনফারেন্স কমিটি দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করেন এবং টীমওয়ার্ক বা দলগত কাজের এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই কাজ তার নিগরানী বা তত্ত্বাবধানেই সাধিত হয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ৭০, আর এরপর ৭১ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন মসজিদের ইমাম ছিলেন। ১৯৬১ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত 'মুসলিম হ্যারাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ১৯৭০ থেকে ৭১ পর্যন্ত। এরপর ১৯৮৫ সনের নভেম্বরে তিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুদ দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং ৮৭ সাল পর্যন্ত উকিলুদ দিওয়ান ছিলেন। রাবওয়ার উকিলুত তাসনীফ হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮২ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। এডিশনাল উকীলুত তবশীর রাবওয়া হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৪ পর্যন্ত। এডিশনাল উকিলুত তাসনীফ, লন্ডন হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৭ থেকে ৯৭ পর্যন্ত। 'রিভিউ অব রিলিজিওন্স'-এর এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। রিভিউ অব রিলিজিওন্স এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৮ থেকে ৯৫ পর্যন্ত। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মেম্বার ছিলেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত। ইফতাহ্ কমিটির মেম্বার ছিলেন ১৯৭১ থেকে ৭৩ পর্যন্ত। কাযা বোর্ডের মেম্বার ছিলেন ১৯৮৪ থেকে ৮৭ পর্যন্ত। অনুরূপভাবে অনেক জাগতিক পদেও কাজ করার সুযোগ তার হয়েছে। ওয়ান্ডস্ওয়ার্থ রোটারী ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, এরপর রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সনে লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জনাব টাব ম্যান এর আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর লাইবেরিয়ার অনারারী চীফ হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয়।

তার পুত্র লিখেন, তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং গভীর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করতেন, এমনকি নাম লিখে দোয়া করতেন যেন কারো নাম ভুলে না যান। অজস্র ধারায় দরূদ পড়তেন। আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে চাঁদার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। তার ভাই কর্ণেল নযীর সাহেব তার

ঘটনা লিখেছেন, যা আমি পূর্বেই সংক্ষেপে বলেছিলাম যে, খলীফা সানী (রা.) যখন তাকে ডাকেন, তখন তিনি ল' কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে পাঠানোর জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার পিতার কাছে পত্র লিখলে তিনি বলেন যে, আমি আইন শাস্ত্র পড়ে জামাতের উত্তম সেবা করতে পারব। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার উত্তরে লিখেছেন, জাগতিক নয় বরং আমাদের ধর্মীয় উকিলের প্রয়োজন। যে জাগতিক মর্যাদা, সম্মান, সম্পদ এবং উন্নতি সে দেখতে চায়, ওয়াকফের বরকতে আল্লাহ্ তা'লা তার সবই তাকে দান করবেন। তিনি বলেন, আমার পিতা (হুযূরের মন্তব্য জানিয়ে) আমার ভাইকে পত্র দেন। পত্র পাঠ করার পর কোন প্রশ্ন না করেই তিনি নিজের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে রাবওয়া চলে যান। এছাড়া দেখুন, খোদা তা'লা কিভাবে এই কথাগুলো পূর্ণ করেছেন। তিনি আইনবিদ হলে হয়তো কেবল জাগতিক সম্মানই লাভ করতেন, কিন্তু এখন তার জাগতিক সম্মানও লাভ হয়েছে আর ধর্মসেবারও সুযোগ হয়েছে। তার ভাই লিখেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যা লিখেছিলেন ওয়াকফের কল্যাণে সেই সবকিছুই তার লাভ হয়েছে, মর্যাদাও লাভ হয়েছে, আর খ্যাতি এবং সম্মানও পেয়েছেন। এক কথায় সবকিছুই তার লাভ হয়েছে। খোদার কৃপায় তিনি অত্যন্ত সফল কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। খিলাফতের সাথে তার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার হৃদপিন্ডে অপারেশনও হয়েছে। এক সময় তো একেবারে আশাহীন এক অবস্থা ছিল। এরপর খোদা তা'লা নবজীবন দান করেন। এই রোগের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বলতায় ভুগতেন, কিন্তু রীতিমত তিনি আমাকে শুধু পত্রই লিখতেন না আর বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতাই প্রকাশ করতেন না বরং যখনই শুনতেন যে, আমি কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি তখন অবশ্যই তিনিও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। এরপর ওয়াকার এর সাহায্যে বা যেভাবেই হোক, অনেক সময় দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি দেখেছি তিনি জুমুআয় অবশ্যই আসতেন আর হেঁটেও আসতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তার পদর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার সন্তান-সন্ততিকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাসহ জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

আমি যেমনটি বলেছি, দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে শ্রদ্ধেয়া নুসরাত জাহান মালেক সাহেবার যিনি মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর লন্ডনে ইহধাম ত্যাগ করেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এমনিতে তিনি রাবওয়ায় বসবাস করতেন, তবে বৃটিশ নাগরিকও ছিলেন। প্রায় প্রতি বছরই লন্ডনে আসতেন। কিছুটা নিজের পেশাদারী দক্ষতা অর্জনের জন্যও বিভিন্ন হাসপাতালে যেতেন। কিছুদিন থেকে কিছুটা অসুস্থ্যও ছিলেন যার জন্য চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। তাই কিছুদিন যাবৎ এখানেই ছিলেন। জলসার পরে হঠাৎ তার বুকে ইনফেকশান হয় এবং তা অবনতির দিকে যেতে থাকে। এরপর ফুসফুসও কাজ করা বন্ধ করে দেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক পর্যায়ে কিছুটা আরোগ্যও লাভ হয় আর ডাক্তাররা আশার বাণীও শুনায়। কিন্তু

একই সাথে আশঙ্কাও ছিল যে, দ্বিতীয়বার ইনফেকশান হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে। যাহোক ঐশী তকদীর ছিল একদিন হঠাৎ তিনি পুনরায় আক্রান্ত হন আর কয়েক ঘন্টার ভিতরই ইন্তেকাল করেন।

১৯৫১ সনের ১৫ই অক্টোবর করাচীতে তার জন্ম হয়। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার পিতা শ্রদ্ধেয় মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবও জামাতের নিষ্ঠাবান সেবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত খান জুলফিকার আলী খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার পৈত্রিক এলাকা ছিল বাজনুর জেলার নজীবাবাদ গ্রাম, যা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। তিনি অর্থাৎ ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার দাদা ১৯০০ সনে পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়আত করেন। পরবর্তীতে ১৯০৩ সনে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। হযরত খান জুলফিকার আলী খান গওহর সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ও বাসনা অনুসারে নিজ পুত্র মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবকে ধর্মের খাতিরে শৈশবেই ওয়াকফ করেছিলেন। যদিও তার জন্ম পরে অর্থাৎ ১৯১১ সনে হয়েছে। তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সনে মৌলভী ফাযেল কোর্স করেন। এরপর ভালো একটি চাকরী হয় তার। কিন্তু মৌলভী আব্দুল মালেক খান সাহেবের পিতা তাকে বলেন বা লিখেন যে, আমি তোমাকে জাগতিক আয় উপার্জনের জন্য পড়ালেখা করাইনি। কারো ধর্মীয় উপার্জনও করা দরকার। এই পত্র পেতেই মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব পদত্যাগ করে কাদিয়ান ফিরে এসে মুবাল্লিগ ক্লাসে যোগ দেন। আর এই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রেরণাই ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার মাঝেও বিদ্যমান ছিল। তিনি পড়ালেখা শেষ করেন যুক্তরাজ্যে। প্রথমে পাকিস্তানে এম বি বি এস করেন আর যুক্তরাজ্যে এসে স্পেশালাইজ করেন। তিনি যে কোন স্থানে গিয়ে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম এবং মানবতার সেবার জন্য ছোট এক শহর রাবওয়ায় এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন আর সেই সময় হাসপাতালেরও প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি সেই প্রয়োজন বা চাহিদা পূর্ণ করেন। আর এরপর সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে এমন সেবা করেছেন যা ছিল পরম উন্নত মার্গের। তার সম্পর্কে অনেকেই নিজেদের আবেগ অনুভূতি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। সেগুলোর সব তুলে ধরা কঠিন, কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তার একমাত্র কন্যা হলেন আয়েশা নুদরাত সাহেবা যিনি এখন যুক্তরাজ্যেই তার স্বামীর সাথে অবস্থান করছেন। তাদের তিন সন্তান রয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, ডাক্তার সাহেবা পাকিস্তানের ফাতেমা জিন্নাহ্ মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. করেন। এরপর ইংল্যান্ড থেকে আর সি ও জি অর্থাৎ রয়েল কলেজ অব অবস্টেটরিশিয়ানস্ এনড গাইনিকোলোজিস্ট থেকে গাইনী বিষয়ে স্পেশালিস্ট এর কোর্স করেন। তিনি ১৯৮৫ সনে ফযলে উমর হাসপাতালে নিজের সেবাকর্ম আরম্ভ করেন, আর ১৯৮৫ সনের ২০শে এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত সেবার দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিজের চিকিৎসার জন্য, আমি যেমনটি বলেছি, তার লিভারের অসুস্থতা ছিল, এর চিকিৎসার জন্য ছুটি নিয়ে গত ৫ই এপ্রিল লন্ডনে এসেছিলেন। চিকিৎসা চলছিল আর আল্লাহ্‌র ফযলে তা সফলও হয়। কিন্তু জলসার পর পুনরায়

তার বুকে ইনফেকশান হয় আর তা থেকেও মনে হচ্ছিল যেন তিনি কিছুটা সুস্থতার দিকে। কিন্তু পুনরায় হঠাৎ রোগের হামলা হয় এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

তার জামাতা মকবুল মুবাশ্বের সাহেব বলেন, খোদার ওপর উনার সুগভীর আত্মবিশ্বাস ছিল। ইবাদতের প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। কুরআনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। স্বতস্ফূর্ত ও একনিষ্ঠভাবে খিলাফতের আনুগত্য, মানব সেবা, রোগীদের আরোগ্য এবং তাদের আরামই তার কাছে অগ্রগণ্য ছিল। আর এই কথাগুলো যা তিনি বর্ণনা করছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবেও এর সাক্ষী যে, তিনি এটি অতিরঞ্জন করছেন না বরং সত্যিকার অর্থেই এসব বৈশিষ্ট্য তার মাঝে ছিল। প্রত্যেক অপারেশন এবং চিকিৎসার পূর্বে দোয়া করতেন। প্রতিদিন সদকা দিতেন। রাবওয়ায় বসবাসকারী বুযুর্গদেরকে নিজের রোগীদের আরোগ্যের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতেন। অনেক দরিদ্র রোগীদের নিজ খরচে বা বন্ধু বান্ধবদের খরচে চিকিৎসা করাতেন। জামাতের টাকা পয়সা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, সর্বদা চেষ্টা করতেন যেন অল্প খরচে কাজ হয় আর জামাতের এক পয়সাও যেন নষ্ট না হয়। তিনি বলেন, আমি লাহোরে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করতাম। আমাকে সবসময় জিজ্ঞেস করতেন যে, অমুক জিনিস তুমি কোন কোম্পানির কাছ থেকে কত মূল্যে ক্রয় করেছ, আর অমুক ঔষধ কোন কোম্পানির কাছ থেকে কত মূল্যে ক্রয় কর। এরপর যথাযথ মনে হলে একই জিনিস ফযলে উমর হাসপাতালের জন্য সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করাতেন। পিতা-মাতার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তাদের অনেক সেবাও করেছেন। মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতার যুগে তিনি তার অনেক সেবা করেছেন। নিজের দায়িত্বও পালন করেছেন আর মায়ের সেবাও করেছেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজের শেষ দিনগুলো বড় ধৈর্য্যের মাঝে এবং সাহসিকতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। শেষ অসুস্থতার সময় হাসপাতালে প্রায় দুই মাস ছিলেন। সবসময় এটিই বলতেন যে, তিলাওয়াত শুনাও। ঘরে সন্তান-সন্ততিদেরও নামায এবং তিলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। সন্তান-সন্ততির মাঝে কোন পুণ্যের অভ্যাস দেখলে, তিলাওয়াত করতে দেখলে আনন্দিত হতেন, তাদেরকে পুরস্কার দিতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন। মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমাদের কন্যার বয়স যখন ১২ বছর হয় তখন তাকে মাথা ঢাকা এবং পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নসীহত করতেন, আর হযরত আম্মাজান এবং অন্যান্য বুযুর্গদের বরাতে ছোট ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা ঘটনার আকারে শিশুদের শোনাতেন। নিজেও পর্দার ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। অতএব পিতামাতা এবং তাদের বড়রা যদি সন্তান-সন্ততিকে নসীহত করতে থাকেন তাহলে মেয়েদের মাঝে পর্দা না করার যে জড়তা রয়েছে তা দূর হয়ে যায় বরং এর সৎসাহস সৃষ্টি হয়।

ফযলে উমর হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার নুসরাত মাজুকা সাহেবা বলেন, ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার সাথে আমার প্রায় ১৮ বছরের সংগ ছিল। হাউজ যব শেষ করেই ফযলে উমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের অংশ হয়ে যাই। আমার সমস্ত পেশাদারী প্রশিক্ষণ ডাক্তার সাহেবাই

দিয়েছেন, তিনি একজন যোগ্য শিক্ষিকা ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কাছে পথের দিশা পেতাম, সুদৃঢ় এবং সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। তিনি অনুগত এবং সহানুভূতিশীল কন্যাও ছিলেন আর একজন স্নেহময়ী মা-ও ছিলেন। একজন সুশৃঙ্খল শিক্ষিকাও ছিলেন এবং সহমর্মী বোন ও বান্ধবীও ছিলেন। তিনি বলেন, তার সারা জীবন ত্যাগে পরিপূর্ণ, জামাতের সেবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে উপেক্ষা করেছেন। তার প্রিফারেন্সেস বা চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক আলাদা ছিল। তিনি বলতেন যে, আমার দুইটি মেয়ে রয়েছে, একটি আমার নিজের কন্যা আর অপরটি হলো আমার কর্মবিভাগ। সর্বদা গাইনী বিভাগের উন্নতির চেষ্টায় রত থাকতেন। রোগীদের জন্য সব সময় সোচ্চার ও সচেতন থাকতেন। আর বিশেষ করে জামাতের দরিদ্র কর্মীদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন, যদি কারো স্ত্রী অসুস্থ্য হতো তাহলে বারবার ফোন করে তাদের রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তার অধীনস্ত কর্মী বাহিনীকে খুবই ভালোবাসতেন, তাদের দিয়ে বেশি কাজ করালে, কোন ক্ষেত্রে কাউকে যদি বেশি কাজ করাতে হয়, কোন রোগীর কারণে, তাহলে ঘর থেকে তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। কঠিন মুহূর্তে তাদের সাহায্যের চেষ্টা করতেন।প্রায় সবাই এই কথাটি লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। আর এটিই সত্যকথা, খিলাফতের সাথে তার অসাধারণ সুসম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, গত বছর থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে সাথে রাখতেন। সকল প্রকার গাইনী সার্জারীও তিনি আমাকে শিখিয়েছেন এবং এটিও বলতেন যে, আমার সময় অনেক অল্প রয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, কেননা তিনি খুবই একটিভ ছিলেন, কিন্তু এখন তার মৃত্যুর পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, নিজের অসুস্থ্যতার কারণে এর কিছু ধারনাও তিনি করেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রাবওয়াবাসীর ওপর তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। আজ প্রতিটি চোখ অশ্রুসিক্ত, প্রতিটি হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। আমার কাছে অনেক পত্র এসেছে আর সকলেই সত্য কথা লিখেছে।

ঘানায় আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার আমাতুল হাই সাহেবা বলেন, আমিও ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার কাছ থেকে প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়েছি। এরপর আমি ঘানা চলে গেলে হোয়াটসএপ এবং ই-মেইলে সব সময় আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিল। গাইনী বিষয়ক কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সানন্দে উত্তর দিতেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। আর সকল সমস্যার সময় তিনি এটিই বলতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে দোয়ার জন্য লেখ। তিনি আরো লিখেন, ডাক্তার সাহেবার সাথে যখন কাজ করতাম তখন ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও তার দৃষ্টি থাকত। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, যখনই তিনি অতিরিক্ত কোন বাতি জ্বলতে দেখতেন তাৎক্ষণিকভাবে তা নিভিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, বিনা কারণে কেন জামাতের পয়সা নষ্ট করছ। এছাড়া বিবাহিতদের বিয়ের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি বলতেন যে, রক্তের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে। তা যদি না থাকে

তবে এটি কখনো সফল হয় না। আর এটি বেশ ভালো একটি ব্যবস্থাপত্র তিনি বলেছেন। সকল দম্পতির এটি মেনে চলা উচিত। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, রাবওয়ায় নতুন গাইনী থিয়েটার নির্মিত হয়েছে, ফিরে গিয়ে সেটি দেখা আমার জন্য সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমাকেও তিনি জানিয়েছিলেন, অথবা তিনি বলেন যে, দেরি হয়ে যেতে পারে তাই নাযেরে আলার হাতে এর উদ্বোধন করিয়ে দিন। আমি তাকে দিক-নির্দেশনা পাঠিয়েছি কেননা কোন ব্যক্তির কারণে জামাতের কাজ বন্ধ হতে পারে না।

রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এর ইনচার্জ ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, গত ৯ বছরের অধিক কাল থেকে শ্রদ্ধেয়া নুসরাত জাহান সাহেবার সাথে ফযলে উমর হাসপাতালের জুবায়দা বানি উইং এবং তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট এ কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মাঝে এমন কিছু গুণাবলী ছিল যা আজকাল অনেক কম ডাক্তারদের মাঝে দেখা যায়। অত্যন্ত নেক, দোয়া পরায়ণ, উন্নত চরিত্রের অধিকারি, খোদা ভীতি পোষণকারী, নিজের রোগীদের জন্য দোয়া পরায়ণ, সূক্ষ্মতার সাথে পর্দা করতে অভ্যস্ত, কুরআনের ব্যপক জ্ঞানের অধিকারি, মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরনকারী মহিলা ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যেও পড়ালেখা করেছেন এবং এরপরও বিভিন্ন হাসপাতালে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আসতেন, কিন্তু সব সময় পর্দার ভিতরে থেকে সম্পূর্ণ নেকাবের পর্দা করেছেন, এবং পুরো বোরকা পরিধান করেছেন, কিন্তু কখনো কোন প্রকার হীনমন্যতা ছিল না। আর পর্দার ভিতরে থেকেই সমস্ত কাজও করেছেন। তাই যেসব মেয়ে অজুহাত দেখায় যে, পর্দার ভিতরে থেকে আমরা কাজ করতে পারি না, তাদের জন্য তিনি একজন আদর্শ নারী ছিলেন। তিনি আরো বলেন, নিজ বিভাগে গভীর দক্ষতা রাখতেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিজের জ্ঞানকে যুগের দাবি অনুসারে বৃদ্ধি করে কাজ করতেন। কখনও নিজের করার সময় সময়ের দিকে তাকাননি। আর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলোর অন্যায় ব্যবহার করেননি। গুরুতর অসুস্থ্য অবস্থায় থাকা রোগীদের জন্য নিজের ছুটি বাদ দিয়ে দৈনিক বার ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে যে, একবার প্রসবের একটি জটিল কেস-এর সময় তিনি সারা রাত জেগে কাজ করেছেন। সম্ভাব্য অপশন সম্পর্কে রোগীদের বিস্তারিত অবহিত করতেন, যে কারণে তার ওপর রোগীদের অনেক আস্থা ছিল। নিয়ম নীতি শত ভাগ মেনে চলতেন। নিজ দায়িত্ব পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত পালন করতেন। কেউ কেউ বলতো, আর আমাকেও অনেকে বলতো যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যদি কঠোর হয়ে থাকেন তাহলে তা নীতি অনুসরণের কারণে, কিন্তু তার হৃদয় খুবই কমল ছিল। উদারতা এবং সহানুভূতিও তার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া এক বৃদ্ধা নারী তার একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার ডাক্তার সাহেবা তার কাজ শেষ করে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি হাসপাতালের কাছে আকসা রোডে দেখেন এবং গাড়ি থামিয়ে আমার

কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং সেখানে দাঁড়িয়েই ঔষধ প্রস্তাব করেন, এরপর চলে যান। তার বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। তার পিতা মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবও খুবই উঁচু পর্যায়ের বক্তা ছিলেন। লাহোরের লাজনার সদর ফৌযিয়া শামীম সাহেবা, নূরী সাহেবকে অবহিত করেন যে, লাহোরের লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাকে ডাকা হলে তার ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মিতার প্রভাব সবার ওপর সমানভাবে পড়ত। তার কথা-বার্তার কেন্দ্রবিন্দু হতো, আহমদীয়াত, খিলাফত এবং খোদার কৃপারাজির বিবরণ। তার বক্তৃতার ধরণে তার মরহুম পিতা আব্দুল মালেক খান সাহেবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত। খিলাফতের সাথে একান্ত বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। মিটিং, সেমিনার এবং ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনের সময়ও খলীফায়ে ওয়াক্তের নির্দেশাবলীর উল্লেখ করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা শুধু বুলি সর্বস্ব ছিল না বরং তার কর্মেও তা প্রকাশ পেত। সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ নারী ছিলেন তিনি।

ডাক্তার মাহমুদ আহমদ আশরাফ সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে অসাধারণ অন্তর দৃষ্টি এবং দূরদর্শিতায় ধন্য করেছিলেন। অনেক সময় রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন প্রোসিডিউর কিছুক্ষণের জন্য বিলম্বিত করতেন, পরে তার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমানিত হতো। খুবই দক্ষ ব্যবস্থাপক ছিলেন, নিজ বিভাগের কাজ খুব সুন্দর ভাবে সমাধা করতেন। নিয়ম-নীতি মেনে চলতেন। নিজের অবস্থানকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন। সকল বিষয় সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা এবং ভবিষ্যতের জন্য তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল তার অভ্যাস। প্রশাসনিক বিষয়ে প্রতাপ ও প্রভাব নিজের জায়গায়, কিন্তু নিজ সহকর্মীদের তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। তার সহানুভূতি এবং স্নেহের গন্ডি কেবল আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, কর্মচারী এবং হাসপাতাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কর্মচারীদের পরিবার, রোগী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন সকলকেই আমরা বারবার তার কাছ থেকে উপকৃত হতে দেখেছি। অভাবীদের খোলা মনে দান করতেন এবং তাদের আত্মসম্মান বোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নীরবে তাদের সেবা করতেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রেকর্ড সংরক্ষিত রাখতেন। তিনি লেখেন যে, আমার জানা মতে তার নেতৃত্বে গাইনী বিভাগের রেকর্ড এখন সবচেয়ে উত্তম এবং সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

একজন মুরব্বী ফুযায়েল আইয়্যায সাহেব লিখেন, তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৮৯ সনে এই অধম যখন জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়াতে সেবার সুযোগ পাচ্ছিল তখন আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার সাহেবা আমাদের চিকিৎসা আরম্ভ করেন, বাচ্চার প্রসবের বিষয় ছিল বা অন্য কোন বিষয় ছিল। যাহোক খুবই স্নেহশীল, নম্র এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। চিকিৎসার সময় একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী হিসেবে আমার স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানরা সব সময় তার বিশেষ স্নেহ এবং ভালোবাসায় ধন্য হয়েছে। আমাদের চার সন্তান, তিন মেয়ে এবং এক পুত্র, যাদের সবার জন্ম ফযলে উমর হাসপাতালেই হয়েছে। তিনি বলেন, আমি উনাকে সব সময় আমার সন্তানদের এবং তাদের মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন দেখেছি।

আমাদের ঘরে যখন চার কন্যার জন্ম হয়, (মনে হয় মোট চার কন্যা এবং এক পুত্র হবে), একবার আমার তৃতীয় কন্যা যার বয়স তখন কেবল চার বছর ছিল তার ঘরে গিয়ে তাকে বলেন, আমাদেরকেও ভাই এনে দিন। তখন ডাক্তার সাহেবা তাকে গভীরভাবে আদর করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের ভাই দান করেন। এরপর তার স্ত্রী যখন অন্তঃসত্তা হন তখন ডাক্তার সাহেবা নিজেও দোয়া করেছেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.)-এর সমীপেও দোয়ার জন্য লিখেন। এছাড়া প্রত্যেক সাক্ষাতে সবার কাছে তার স্ত্রীর জন্য দোয়ার অনুরোধ করতেন। তিনি বলেন, অবশেষে খোদা কৃপা করেছেন, আর ছেলের জন্ম হওয়ার পর তিনি স্বয়ং এসে আমাদের ঘর থেকে আমাদের মেয়েকে নিয়ে যান এবং বলেন, এই নাও, খোদা তা'লা তোমাকে ভাই দিয়েছেন। এরপর নিজের গাড়িতে করে আমার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে যান।

তার কাছে অনেক অ-আহমদী রোগীও আসত। একবার তিনি নিজেই শুনিয়েছেন যে, চিনিওটের অ-আহমদী এক মৌলভী সাহেব আসে, তার স্ত্রীর সন্তান হচ্ছিল না। ডাক্তার সাহেবার চিকিৎসায় আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন এবং তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হয়। তিনি বলেন, এখন তো মৌলভী সাহেব ৯ মাস আমার নিয়ন্ত্রণে আছেন। আর তাকে তিনি এই ৯ মাস অনেক তবলীগ করেন এবং কোন প্রকার ভয়-ভীতি তখন তার ছিল না।

এরপর আরবী ডেস্কে কর্মরত তাহের নাদিম সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেবার ঔষধের চেয়ে দোয়ার ওপরই বেশি ভরসা ছিল। তিনি বলেন, আমি লন্ডন চলে আসলেও আমার স্ত্রী সেখানেই ছিল। তার স্ত্রীর কোন অপারেশনের প্রয়োজন ছিল, আশঙ্কা দেখা দেয়। ডাক্তার সাহেবা স্বয়ং জানিয়েছেন যে, তখন আমি কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি যে, হে আল্লাহ্! ইনি ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী, তার স্বামী তোমার ধর্মের সেবার জন্য গিয়েছে, তাই তুমি কৃপা কর। অতএব কিছুক্ষণ পর খোদা তা'লা এমনভাবে ফযল করেন যে, যেই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং অপারেশনেরও আর প্রয়োজন পড়েনি। তার আতিথেয়তা সম্পর্কে তাহের নাদিম সাহেব লিখেন যে, হিওয়ারুল মোবাশের প্রোগ্রামের জন্য আরবরা এখানে আসে এবং অবস্থান করে, লন্ডনে ৫৩টি গেষ্ট হাউজ আছে। তিনি নিজেও সেখানে অবস্থান করছিলেন, আর আরবাও সেখানে অবস্থান করছিল। একদিন তিনি তার মেয়ের সাথে কিচেন বা রান্নাঘরে পরটা প্রস্তুত করছিলেন। তিনি বলেন, আরবদের মাঝে আপনারা যারা এসেছেন এবং হিওয়ারুল মোবাশের প্রোগ্রামে যোগ দিচ্ছেন, আমি চেয়েছি আপনারা যারা ধর্মের সেবা করছেন তাদেরকে নিজ হাতে পরটা বানিয়ে খাওয়াই, আর এভাবে আমি নিজেও যেন এই জিহাদের পুণ্যে অংশীদার হয়ে যাই।

আমাদের জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব তার সচেতনতা এবং পর্দা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ডাক্তার সাহেবাকে সর্বদা পর্দা পরিহিতা এবং পর্দার সর্বোত্তম রূপ নিয়ে সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের মত দৌড়ঝাপ করতে দেখা যেত। যেসব মহিলা পর্দাকে বাঁধা মনে করেন তাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। সম্পূর্ণ দিন কাজ করতেন আর খুবই সক্রিয়

ও কর্মঠ থাকতেন, কখনো ক্লান্তি প্রকাশ করতেন না। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব বলেন, সদর আঞ্জুমানের কোয়ার্টারে আমরাও থাকতাম আর তিনিও থাকতেন। সে যুগে রাবওয়ার পরিবেশ ছিল, অকৃত্রিমতা ছিল, আসা-যাওয়া বা আনাগোনা ছিল। তিনি মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের পুত্র। তার পিতা এবং মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কোন পুত্র যেহেতু সেখানে ছিল না তাই দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব তার পুত্রকে বলেন, তাদের বাড়ির খবরাখবর রাখবে যে, কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা, বাজার থেকে কিছু আনার বা ক্রয় করার প্রয়োজন হলে তা করে দিবে। তাই তিনি সেখানে যেতেন আর এ দিক থেকে অত্যন্ত অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, এভাবে ডাক্তার সাহেবার সাথেও জানা শোনা ছিল। তাকেও জিজ্ঞেস করতাম যে, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। এরপর হাসপাতালেও আমরা সহকর্মী ছিলাম। তার সামান্য কোন কাজ করে দিলে তিনি এত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন সীমা থাকত না। এরপর তার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী আর তাকেও উপহার সামগ্রী দিতেন।

তার বিভাগ ছিল গাইনী বিভাগ। তিনি লিখেন, এটিকে আধুনিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রায় প্রত্যেক বছর তিনি ইংল্যান্ড-এ গিয়ে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিখে আসতেন। আর ব্যক্তিগত খরচে আসতেন এমন নয় যে, জামাতি খরচে আসা যাওয়া করতেন। সেইসাথে বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে নতুন মেশিনও আনতেন। সম্প্রতি জোবাইদা বানী উইং-এর নতুন অপারেশন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, কিন্তু এটি ব্যবহারের সুযোগ পাননি। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান ডাক্তারদের সঠিকভাবে এটি ব্যবহারের তৌফিক দিন। তিনি আরো লিখেন, এই বিভাগের বর্তমান শেপ বা আকৃতি যা একটি কক্ষ থেকে আরম্ভ হয়েছিল, ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগ শুধু একটি কক্ষেই সীমিত ছিল, আজকে একটি পুরো উইং-এ রূপ নিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার যোগ্যতা এবং দিবা-রাত্রির পরিশ্রম আর আন্তরিকতা ও আবেগ-অনুভূতি এবং উচ্ছ্বাসের গভীর ভূমিকা রয়েছে। তার একজন ষ্টাফ নার্স জামিলা সাহেবা লিখেন, ডাক্তার সাহেবার ইন্তেকালে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। ডাক্তার সাহেবা খুবই ভালো এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন ডাক্তার ছিলেন। আমাদের সবার প্রতি গভীর যত্নবান ছিলেন। আমাদেরকে সন্তানের মত ভালোবাসতেন এবং খুব যত্ন নিতেন। যে সমস্ত দরিদ্র বা গরীব রোগী আসত তাদের এন্ট্রি ফি-ও ফেরত দিয়ে দিতেন আর ঔষধও নিজের কাছ থেকেই প্রদান করতেন।

আরেকজন স্টাফ নার্স মুসাররাত সাহেবা লিখেন, সর্বোত্তম স্নেহশীল এক শিক্ষক এবং অত্যন্ত যোগ্য ডাক্তার ছিলেন। আমি প্রায় ৩১ বছর তার অধীনে অতিবাহিত করেছি। খুবই স্নেহময়ী ও সংবেদনশীল ছিলেন, প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে সঙ্গ দিতেন। বড়দের প্রতি সহানুভূতিশীল, শিশুদের প্রতি খুবই ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা, রোগীদের সাথে ভালোবাসার ব্যবহার করা, তাদের কষ্টকে

নিজের কষ্ট মনে করা, সকল কর্মচারীকে সর্বদা উন্নত এবং ভালো ব্যবহারের উপদেশ দেয়া তার বৈশিষ্ট্য ছিল। খলীফার ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তার একজন মহিলা রোগী লিখেন, একবার আমার চিকিৎসা করছিলেন, আর একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী হিসেবে আমার প্রতি অনেক মনোযোগ রাখতেন। একবার আমার আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করানোর প্রয়োজন ছিল, তিনি তার সহকারীকে বলেন, তার আল্ট্রসোনোগ্রাফ করে দাও, তখন অনেক ভিড় ছিল আর সেখানে একটি মাত্র চেয়ার ছিল যাতে একজন দরিদ্র মহিলা বসেছিলেন। যেহেতু ডাক্তার সাহেবা এ রোগীকে পাঠিয়েছেন তাই তার সহকারী সেই মহিলাকে উঠিয়ে তাকে চেয়ারে বসাতে চেয়েছেন। তখন হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ আসে যে, না, তুমি ঐ চেয়ারে নয় বরং এটিতে বস। আমরা দেখতে পাই যে, ডাক্তার সাহেবা নিজেই একটি চেয়ার নিয়ে আসছিলেন যেন দ্বিতীয় দরিদ্র মহিলা রোগী এটি মনে না করেন যে, আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, কেননা সব রোগীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কিন্তু অপর দিকে তার অবস্থাও দেখেন যার কারণে বসার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য নিজেই চেয়ার নিয়ে আসেন এবং নিজের মহিলা রোগীকে সেখানে বসিয়ে দেন।

এরপর আরেকজন ডাক্তার সাহেবা রয়েছেন, তিনি লিখেন, জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমানী ছিলেন, খিলাফতের প্রতি সুগভীর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজের সহকর্মী ডাক্তারদেরও উৎসাহিত করতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং সব সময় দোয়ার জন্য লিখ। খলীফায়ে ওয়াক্ত-এর কাছে যখনই তিনি দোয়ার জন্য লিখতেন তখন আমাদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করতেন। তিনি লিখেন যে, আপনার পক্ষ থেকে যখনই কোন উত্তর আসত, সবাইকে তা পড়ে শুনাতেন। তখন তার চোখে এক আনন্দ বিরাজ করত আর তার কণ্ঠেও এবং তার চোখ থেকেও তা স্পষ্ট বুঝা যেত। তিনি বলেন, আমাদের সবার ঈমান বৃদ্ধির কারণ ছিলেন তিনি। জামাতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে নিজের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ এবং সম্পদই শুধু কুরবানী করেন নি বরং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের সমস্ত ডাক্তারদেরকে জীবন উৎসর্গ করা এবং জামাতের সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তার সাথে কাজ করে প্রতিদিনই ঈমান সতেজ হত আর হৃদয়ে ওয়াকফের গভীর প্রেরণা পেতাম। আমাদের প্রেস বিভাগের আবেদ খান সাহেব খিলাফতের সাথে তার সম্পর্ক এবং আনুগত্যের একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একবার তিনি আমাকে বলেন, আমি যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের মুখে কোন কথা ভাসা ভাসাও শুনি, তাহলে তা নির্দেশ না হলেও বরং কোন সাধারণ কথা হলেও সেটিকে আমি নির্দেশ মনে করি এবং তা মেনে চলার চেষ্টা করি। অতএব, এই হলো বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সেই মান যা তার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

আরো অনেকেই তার সম্পর্কে লিখেছেন, এখন সব কিছু বলা কঠিন। এক মহিলা লিখেছেন, একবার আমি আমার ঘর থেকে, যা হাসপাতালের পিছনে, লাজনার অফিসে যাচ্ছিলাম, আর তিনি জামাতের গাড়িতে করে বেরিয়ে আসছিলেন, কোন জামাতী কাজে যাচ্ছিলেন হয়তো। তিনি আমাকে

জিজ্ঞেস করেন যে, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, লাজনা অফিসে আমার অমুক ডিউটি আছে। তখন তিনি ড্রাইভারকে বলেন, প্রথমে তাকে লাজনার অফিসে নিয়ে যাও কেননা তিনি জামাতী কাজে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, জামাতী গাড়ি আমি শুধু জামাতী কাজের জন্যই ব্যবহার করি।

তার কন্যা নুদরাত আয়েশা সাহেবা বর্ণনা করেন, আমার মা একজন আদর্শ মা। তিনি খুবই স্নেহশীল একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য অনেক দোয়া করতেন। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত তাৎক্ষণিকভাবে মাকে ফোন করতাম আর ফোন করে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পরবর্তীতে সেই কাজ সহজও হয়ে যেত। এরপর তিনি আমাকে বলতেন যে, তুমি কৃজ্ঞতার সিজদা কর। সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার লালন-পালন এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং সৎ সাহসী ছিলেন যে, পিতা-মাতা উভয় হয়েই তিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। কখনো তিনি যদি মনে করতেন যে, সঠিকভাবে কন্যার যত্ন নিতে পারেননি তাহলে বলতেন, ব্যস্ততার কারণে মেয়েকে আমি ততটা সময় দিতে পারি না কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আরো বলতেন যে, মানবতার সেবায় যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি, আল্লাহ্ তা'লা আমার সন্তানের কাজ নিজেই সহজ করবেন। সব সময় আমাকে বলতেন, তোমাদের নানাজান তার সন্তানদের দু'টো নসীহত করেছেন, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা। আর সেই নসীহতই আমি তোমাকে করছি যে, সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো আর নিজেকে এবং সন্তান-সন্ততিদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রেখো। তিনি আরো লিখেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যখন অসুস্থ্য হন আর ভেন্টিলেটার লাগানো হচ্ছিল তখন নামায পড়েন এবং আমার মোবাইলে কুরআন শরীফ পড়েন। আর একটি কাগজ এবং কলম চেয়ে নিয়ে তাতে লিখে দেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তকে বারবার দোয়ার বার্তা বা পয়গাম প্রেরণ কর। তিনি বলেন, আমি আমার মাকে অসাধারণ নিষ্ঠাবান এবং জামাতী খিদমতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। ফযলে ওমর হাসপাতালের ছোট একটি কন্সালটেশন কক্ষে মায়ের খিদমতের সূচনা হয়। এই কক্ষের একদিকে একটি কাউচ বা গদি আর অপর দিকে একটি সাদামাটা টেবিল চেয়ার রাখা ছিল। তার খিদমতের প্রেরণা এবং দোয়া প্রথমে তাকে লেবার ওয়ার্ড এবং এরপর গাইনী বিভাগের পৃথক বিল্ডিং দান করেছেন যেটিকে তিনি এবং তার টিম গভীর আগ্রহ ও প্রেরণার সাথে একটি সফল উইং-এ পরিবর্তন করেছেন। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা জন্য তিনি লাহোর এবং ফসালাবাদ যেতেন আর কোন কোন সফরে আমিও তার সাথে ছিলাম। প্রত্যেক দোকানদারের কাছ থেকে তিনি কোটেশন নিতেন আর জামাতের পয়সা সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন।

তিনি বলেন, একবার আমার মেয়ে আলিয়া ১৫ দিনের জন্য রাবওয়া এসেছিল, তাকেও তার বিভাগের কাজে শামিল করেন যে, তুমি টাইপিং-এ সাহায্য কর, তোমার টাইপিং-এর গতি ভালো আর জামাতের সেবা করা একটি পরম সৌভাগ্য, তাই তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হও। নিজের

কাজের প্রতি এমন একাগ্রতা ছিল যে, তার রোগের শেষ দিনগুলোতেও হাসপাতালের নাম শুনলে তার চেহারায় মুচকি হাসি চলে আসত। আর তন্দ্রার অবস্থাতেও হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার এবং বিভিন্ন মেশিন বানানোর কোম্পানির নাম নিতেন যা শুনে ইংরেজ নার্সরাও আশ্চর্য হত আর আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে, ইনি কী বলছেন? আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল ছিল। রোগের ভয়াবহতার সময় কয়েকদিন তার জন্য কথা বলাও সম্ভব হয় নি। যখন স্পিকিং ভালব লাগান হয় তখন প্রথম যে বাক্য তার মুখ থেকে বের হয় তা হলো, হে আমার মেয়ে! আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। আর আমার কান্না পেলে চোখের ইশারায় আল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গীত করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার একমাত্র কন্যাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আর তার মা তাকে যে সমস্ত নসীহত করেছেন এবং তার কাছে যে সমস্ত প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই প্রত্যাশা পুরণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা এই মেয়েকেও আর তার সন্তানদেরও নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, মরহুমার পদমর্যাদাও উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। আল্লাহ্ তা'লা ফযলে ওমর হাসপাতালকে এমন খিদমতকারী এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালনকারী, আনুগত্যের সাথে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং খিলাফতের আনুগত্যকারী অরো ডাক্তার দান করতে থাকুন। আর বর্তমানে যারা এই কাজে রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তরোত্তর নিজেদের কাজে উন্নতি দান করুন।

জুমার নামাযের পর আমি তাদের উভয়েরই গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।